মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—ক্ষুধা, খাদ্য, খাওয়া, না খাওয়ার আখর

শুভময় মণ্ডল

অখ্যানচর্চার শুরু থেকেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুধাগ্রস্ত মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন, নিরীক্ষণ করেছেন ক্ষুধাগ্রস্তের মনস্তত্ব, সেই লড়াই একঢালা নয়। নেহাত ক্ষুধাপীড়িতের যাতনার বর্ণনা নয়, ক্ষুধাপীড়িতের আর্তি, ফরিয়াদ বা শুধুমাত্র খিদের সঙ্গে লড়াইয়ের নানা ধরনও নয়। খিদে নিয়ে কখনও বিরাগ, কখনও ঔদাসীন্য, কখনও খিদে ছিঁড়ে ফেলবে মাণিকবাবুর মানুষদের, অথবা মাণিকবাবুর মানুষেরাই প্রায়শই আদিম হিংস্রতায় আক্রমণ করবে খিদেকে। অথবা খিদেই হয়ে উঠবে জীবনযুদ্ধের পাঠ নেওয়ার বুনিয়াদী অধ্যায়।

আর খিদের সঙ্গে তাঁর মানুষদের এইসব নিরন্তর সংলাপ, অথবা সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ধারণে যখন মগ্ন হয় তাঁর গদ্য, সেও যেন রচনা করে নেয় এক ব্যূহ। যে ব্যূহ তার জটিলতাকে আশ্চর্য সারল্যে ঢেকে রাখে, পাঠককে অনায়াসে টেনে নেয় তার গহনে।

পদ্মানদীর মাঝি-র কুবের খিদের মোকাবিলায় তার কচি দুই ছেলের লড়াই আশ্চর্য ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখে, অথবা নিপাট উদ্দেশ্য নিয়েই দেখে, অথবা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সে তার দুই ছেলেকে দানার লড়াইয়ে লেলিয়ে দেয়, কারণ সে জানে খিদেই তাদের দুনিয়ায় জীবনযুদ্ধের বুনিয়াদী পাঠ, সে পাঠ নিতে অভ্যস্ত হোক তার সন্তান। পিসির দেওয়া চিড়া, গণেশ ও কুবেরের জন্য। গণেশ কুবেরকে অগ্রাধিকার দেয় সেই চিড়ার ভাগে কারণ, তার খিদে তুলনায় প্রশমিত ছিল বাড়ি থেকে খেয়ে আসা পান্তাভাতে। সেই বাড়তি সুবিধা লাভের পরই কুবের তার চিড়া থেকে ভাগ দেয় বড় ছেলে লখাইকে এই নির্দেশসহ 'চন্ডীরে দুগা দিস লখ্যা।' লখাই এই নির্দেশ অস্বীকার করে। ফলে দুই পুত্রের মধ্যে লড়াই। মানিক বন্দ্যোপাধায় লিখেছেন—

কুবের আর চাহিয়া দেখিল না। এ যে তার ঠিক উদাসীনতা তা বলা যায় না। মনে মনে তাহার একটা অস্পষ্টউদ্দেশ্যই বুঝি আছে। শিক্ষা হোক। নিজের নিজের ভাগ বুঝিয়া লইতে শিখুক। দু-দিন পরে জীবনযুদ্ধে সমস্ত জগতের সঙ্গে যখন তাদের লড়াই বাঁধিবে তখন মধ্যস্থতা করিতে আসিবে কে?

সুতরাং খিদের মোকাবিলার মধ্যে দিয়ে জীবনযুদ্ধে লড়াইয়ের দীক্ষা হয়ে যাচ্ছে লখাই আর চন্ডীর। সোনাখালির জমিদারদের রথ বিশ্রাম নেয়। সাত দিন পরে আবার যাত্রা করে উলটোপানে। অন্নবাবার এহেন নামকরণের ইতিবৃত্তও সংক্ষেপে বলে দেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভিক্ষের দিনকালেও কোনও এক সন্ন্যাসীর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া—যার হুকুমে ও অনুপ্রেরণায় 'জমিদার মহাজনেরা মনে মনে চাল - ডাল পাঠাইয়া দিত এই মাঠে। শত শত ভদ্র গৃহস্থ নিজেরাই কোমর বাঁধিয়া তাহা রান্না করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীদের বিতরণ করিত অন্ন। এইমতো বর্ণনার পরেই গোটা ইতিবৃত্তই আবার অলীক অবস্থানে ঠেলে দেন। সমগ্র ইতিবৃত্তকেই সংশয়ের কুহরে ফেলে দেন।

ব্যাপারটা যে ঠিক এইরকম ঘটিয়াছিল তার কোন প্রমাণ এখন আর নাই।

ক্ষুধা, ক্ষুধা-নিবারণের আখ্যান—এসব নিয়ে এক আশ্চর্য বাজিকর খেলায় মেতেছেন মাণিকবাবু। সত্য যেন এক ব্যূহের মতো হইয়া ওঠে। কখনও তার ভিতরে প্রবেশে পথ দেখায়। সে পথে প্রবেশের পর আমরা দেখি, আসলে পথটাই ছিল অলীক, সেটা আসলে পথ নয়, ফাঁদ। ফাঁদ এই কারণেই সে পথে শুধু ঢোকা যায়, বার হওয়ার সময় সে পথ অন্তর্হিত হয়। ক্ষুধা নিবৃত্তির একটা গল্প গড়ে দিয়ে তাই সহসা মাণিকবাবু সেই গল্পটাই ভেঙে দিলেন। হয়তো বলে দিলেন যে জগতের গল্পের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি যেখানে, সেখানে ক্ষুধা প্রশমনের সকল সম্ভাবনাই আসলে মরীচিকা মাত্র।

অথবা আরও স্পষ্টতর কোনও উদ্দেশ্যই কি এখন বাক্য দিয়ে অন্নবাবার মাঠের ওই ইতিবৃত্ত শেষ করেছেন!—

যেসব বড়ো বড়ো উনানে সেই বিরাট ক্ষুধা যজ্ঞের আগুন জ্বলিত আজ তাহার একটু কালির দাগ পর্যন্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাবে না।

তাহলে কি এই গদ্য, যা পদ্মানদীর মাঝি-র প্রবাহিত গদ্য, যা উপন্যাস, সে কি অন্নবাবার মাঠের ইতিবৃত্তের ঠিক উলটো দিকে বইছে। এখানে এখন হঠাৎ হাজির হওয়া কোনো সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীপ্রতিম জন, কোনো জমিদার বা মহাজন, কোনো গৃহস্থজন আর বৃহত্তরের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে উদ্যোগ নেবে না, সেই অন্তর্হিত হয়েছে কবে, এখন এরা— এই সন্ন্যাসী প্রতিমজনেরা অথবা এই গৃহস্থ ভদ্রলোকরো খিদের মধ্যে বাস করা খেটে খাওয়া মানুষকে অধিকতর খিদের দিকে ঠেলে দেবে, ছেদহীন খিদের দিকে ঠেলে দিতে জাল বুনে খাওয়ার উপক্রম ও আয়োজন অথবা না-খাওয়া এসবই যেন ঘটনার মুখে, প্রতিটি ঘটনাধারার মুখে নান্দীমুখ দাঁড়িয়ে থাকে, লোকজন অথবা শাস্ত্রীয় আচারের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অথবা সেইসব আচারের বিকারের মতো, ব্যাঙ্গের মতো।

খিদেকে উপশম করা, তৃপ্ত করার আয়োজনেই সিধুকে ঠেলে দিয়েছিল কুবেরের আবাসে। কুবের নিজে তখন 'অত্যন্ত ক্ষুধায়'। সেই খিদের জন্য সে রামুর বৃত্তান্ত শুনতে যায়নি। তখনই কুবেরের বাড়িতে ক্ষুধানিবৃত্তির আয়োজন। 'পিসি হাঁড়িতে ভাত ফুটাইতেছে।' তখন বৃত্তান্তের লোভের থেকে ভাতের লোভ কুবেরের কাছে অনেক বড়ো। সেই 'পেটে ক্ষুধার জ্বালা' নিয়েই সিধু গৌরচন্দ্রিকার মুখে বসে আছে কুবের। যা আসলে সিধুর ক্ষুধা-শ্রমের আয়োজন গৌরচন্দ্রিকা। সেই গৌরচন্দ্রিকা একমুঠো চাল দে কুবেরের প্রতি সিধুর প্রতিশ্রুতি 'তরেও দিম্যুনে ব্যানুন।'

এই প্রতিশ্রুতি আসলে মিথ্যাচার। মিথ্যাচারে পরিণত নয়। এই প্রতিশ্রুতি দেয় ক্ষুধার্ত মুহূর্ত অজান্তে চকিতেই সে প্রতিশ্রুতিকেই খুন করে ফেলে। এই প্রতিশ্রুতি যে মিথ্যাচার হয়তো কুবেরও জানত। হয়তো জানত না। ক্ষুধার্ত

মানুষ অন্য ক্ষুধার্তের কাছ থেকে খাদ্য পাবার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা জেনে ক্ষুধার্ত আশায় তাকে সত্যি ভাবে।

সে প্রতিশ্রুতি, যথাবিহিত মিথ্যাই হয়। কুবের আবিষ্কার করে রাত যখন ভরা। খালি পেটে ঘুমিয়ে পড়েছে হোসেন মিঞা। এই পরিস্থিতিটুকু বর্ণনাতেই একাধিকবার 'খাওয়া' ক্রিয়াপদটি নিয়ে একাধিকবার বাজিকরের মতো চালাচালি করছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। হোসেন মিঞাকে খাওয়ানোর ভাবনার একটি পর্যায়েই কুবের সেই সংবাদ শোনে— সিধু ব্যঞ্জন দেয়নি। সেই মিথ্যাকে ঢাকতে সিধু নয়া মিথ্যা জুড়ে দিয়েছিল, 'বিড়াল সব খাইয়া গেছে গা।' খিদের এই নানান ফাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যখন পদ্মা নদীর মাঝির দ্বিতীয় অধ্যায়। যেমন আমরা বলতে চাইছি এই দ্বিতীয় অধ্যায় তামাম উপন্যাসকেই নিয়ন্ত্রণ করবে। খিদের এই ফাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হোসেন মিঞার পকেটে রাখা ব্যাগের দিকে হাত বাড়ায় কুবের। চুরি করে কয়েকটা খুচরো পয়সা। যা আসলে আর একটা ফাঁদের মধ্যে পড়া। যে ফাঁদ থেকে শেষ পর্যন্ত বার হতে পারবে না কুবের।

অতএব পদ্মানদীর মাঝি-র সকল ফাঁদের, নৃশংসতর, প্রগাঢ়তর সব ফাঁদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে খিদের ফাঁদ।

এতক্ষণ আমরা সকল কথাই বলছিলাম একটি উপন্যাসের একটি মাত্র অধ্যায় নিয়ে। যা পদ্মানদীর মাঝির দ্বিতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায় যদি সারা পদ্মানদীর মাঝিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যেমন করে আমরা ভাবতে চাইছি, তবে উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের কয়েকটি বাক্য যেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পর্বের মানসলহরকে এক ঝলক ছুঁয়ে ফেলার উপায় হয়ে ওঠে।

জেলেপাড়ার বর্ণনায় সেই বাক্যগুলি। হয়তো তারা মাণিকবাবু ঘরানার বাক্য নয়। উদাসীন ভ্রূ-ভঙ্গীর তলায় মানিকবাবু যেমন বাক্য ছড়িয়ে দেন, আপাত-নিরীহ, সোজাসাপটা শরীরের তলায় ঘাপটি মেরে থাকা ভীষণ তপ্ত, ধারাল আর তেজস্ক্রিয় বাক্য— এ বাক্যগুলি তেমন নয়। এরা ভীষণ উদ্দেশ্যমূলক, বাইরে থেকে তাকালেই বোঝা যায় খুব সচেতনভাবেই এদের প্রয়োজন করা হয়েছে এবং এরা চালে এবং তালে যথেষ্ট ওজনদার। জেলেপাড়ায় বর্ণনায় সেই বাক্যগুলি।

জেলেপাড়ায় ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয়।

কয়েকটি বাক্য পরেই প্রসঙ্গ ক্ষুধা এবং প্রসঙ্গ ঈশ্বর আবার ফিরে আসছে আরও এবং উদ্দেশ্যের আরও তীব্রতা নিয়ে:

জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লিতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

একটু স্পষ্ট হয় যে, শুধু খিদে নয়, খিদে যে বিকার আনে সেদিকেও তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে চাইছেন মাণিকবাবু। যাদের ক্ষুধার অন্ন যথেষ্ট জোটে না, তাদেরই যথেষ্ট চাই ক্ষুধার অন্নচাপা মদ। ক্ষুধার অন্নচাপা মদ চাই ক্ষুধার সচেতনতাকে খুন করতে। যে মদ সংগ্রহের প্রয়াস, যে মদ গলাধঃকরণের বিকার ক্ষুধাকেই আরও নিরন্তর ও অনিঃশেষ করে রাখবে।

এবং ঈশ্বর। দেবতা ও ঈশ্বর শব্দদুটির মধ্যেও পার্থক্য দেগে রাখলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সকল দেবতাই কি তাহলে ঈশ্বর নয়। কেবলমাত্র কুলীন দেবতা, সব-পাওয়া মানুষের দেবতা ঈশ্বর। ঈশ্বর শব্দটির আরও একবার প্রগাঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োগ করেছিলেন 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে। পূর্বাশা-র প্রকাশকাল মনে রাখলে এই গল্প পদ্মানদীর পূর্বজ। এবং এ গল্পও খিদের গল্প। প্রসঙ্গ খাওয়া, খাদ্যসংগ্রহের প্রয়াস ও খাদ্য এ গল্প প্রায় ধুয়োর মতো ফিরে আসে। এবং এর পরই থাকে অন্যবিধ এক খিদের কথা। যা যৌনতার। আমাদের এ লিখনে যৌনতার প্রসঙ্গ থাকছে না, আমরা শুধু জঠরের খিদে আখ্যানেই মনোনিবেশ করতে চাইছি। তবু প্রাগৈতিহাসিক -এর প্রসঙ্গ উঠলে এটুকু বলে নিতে হবে, প্রাগৈতিহাসিক আসলে ওই দ্বিবিধ খিদেরই গল্প। কোনও একটা খিদেকে বাদ দিলে এ গল্প গল্পই হয়ে ওঠে না। এখানে প্রাথমিক খিদে অবশ্যই জঠরের, কিন্তু পরের দাপেই আসে যৌনতার খিদে, যা মাধ্যমিক এবং অনিবার্যও। প্রহ্লাদের ঘরে খেতে পাওয়ার পরই ভিখু দানার আমদানি সুগম হওয়ার বর্ণনার পরই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় চারবার ভিক্ষু প্রসঙ্গে নারীর অনুষঙ্গ যোজনা করেছেন।

১। মেয়েরা নদীর ঘাটে স্নান করতে নামলে ভিক্ষু সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

২। মেয়েরা তাকে ভয় পেলে সে খুশী হয় বেং মেয়েরা সরে যেতে বললে সে দুর্বিনীত হাসি হাসে।

৩। রাতে শুয়ে সে ছটফট করে। অবশ্যই নারীর অভাবে। এক বাক্যের এই অনুচ্ছেদে নারী শব্দটির কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

৪। নারীসঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভাল লাগে না। সুতরাং ভিখুর মতো দোর্দন্ড প্রাণসম্পন্ন জীবনে জঠরের খিদের শমের পর নারীর খিদে দংশন করবেই এবং তেমনটিই অনিবার্য। সুতরাং ভিখুর খিদের স্পষ্ট দুই এলাকা; 'পৃথিবীর যত খাদ্য এবং নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না। এবং এই দুই স্পষ্ট খিদে। খাদ্য ও নারীর খিদে, এদের নিয়ে তার অত্যন্ত অতৃপ্তি, উপশমহীনতার কারণও ভিখু জানে। তার টাকার অভাব। 'কত দোকানে গভীর রাত্রে সমান টাকার নোট সাজাইয়া একা বসিয়া দোকানি হিসাব মেলায়, বিদেশগত

কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা একা থাকে'। ভিখুর সয় না। ফলে এই খিদে মেটানোর জন্য ভিখুর লড়াইটা ধরনে গড়নে একেবারেই আদিম। সে অপেক্ষাকৃত বিত্তসম্পন্ন, নারীসম্পন্ন পুরুষকে খুন করেই সংগ্রহ করে নারী ও অর্থ।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকজীবনের প্রথম ত্রিবর্ষের মধ্যেই লেখা 'প্রাগৈতিহাসিক' প্রসঙ্গে যৌনক্ষুধার কথা উঠে গেলেও আমাদের এই লিখন পূর্ণতই জঠরের খিদে নিয়ে। এক্ষণেই বলে রাখা ভালো মাণিকবাবু বিশ্বাস করতেন ''মানুষের যৌন কামনার চেয়ে অন্নকামনা শক্তিশালী।'' জঠরের খিদে এবং যৌন কামনা— উভয়কেই স্বাভাবিক এবং প্রকৃতির ধর্ম জেনেও এই দুই খিদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, যে দেখানো দর্শনের আদিতম সত্যেরই মতো : ''খেতে না পেলে মানুষ বাঁচে না কিন্তু শুধু খেতে পেলে যৌনকামনার সহস্র বিকার নিয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।'' এবং মাণিকবাবু ১৩৫১ সালে যৌনজীবন নিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে স্পষ্টই জানালেন, আর্থ - সামাজিক - রাজনৈতিক কারণেই যে সমাজের মানুষ নিরন্তর ক্ষুধার মধ্যে বাস করে, সেই মানুষের যৌনজীবনও জটিল এবং নীচুস্তরের। সুতরাং উভয় খিদেকে স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিধর্ম জেনেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোধে অন্নক্ষুধাই আদিতম।

এবং উল্লিখিত এই সাক্ষাৎকার, পুনরাবৃত্তি হলেও আর একবার বলে নেওয়া হোক, ১৩৫১ সালের (তখনও প্রায় ৩০ লক্ষ বাঙালির মরে পচে যাওয়ার গন্ধ বাতাস থেকে একেবারে সরে যায়নি নিশ্চয়), এবং এই সাক্ষাৎকারেই আর একটি বাক্যও তিনি অনিবার্যতই বলেছেন— ''অন্নাভাবে অসংখ্য লোকের মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভব হয়...।''

অন্নাভাবে অসংখ্য মানুষের মরে যাওয়াই যে সমাজের সমাকীর্ণ বাস্তবতা, সেই সমাজকে দেখবার সুযোগ পেলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সুযোগ' শব্দটা নিশ্চয়ই খুব নির্দয়। তবু সুযোগ তো বটেই, গাঁওবাসী হলে অন্নাভাবের খিদে তাঁকেই ছুঁত, কিন্তু শহরবাসী (তখন তিনি টালিগঞ্জে) হওয়ার সুবাদে তিনি ছুঁয়ে দেখার দূরত্বেই দেখবার সুযোগ পেলেন অন্নাভাবে মৃত অথবা মুমূর্ষু কয়েক লক্ষ মানুষকে। এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক, এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিনে কণিউনিস্ট পার্টির দিকে দিব্যি ঝুঁকে গেছেন, শুধু দেখবেন কেন? তিনি ক্ষুধাজনিত ওই মরণের মোচ্ছবের অর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ খুঁজে বুঝতে চাইলেন, লাখো মানুষের খিদেয় মরে যাওয়ার যাতনাকে ধারণ করলেন, লিখে রাখলেন তার সবথেকে বিশ্বস্ত আখ্যান দলিল। সামাজিকভাবে, অর্থনীতিগতভাবে এবং রাজনীতিগতভাবে মন্বন্তরী খিদের সবথেকে বিশ্বস্ত আখ্যান-দলিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে ৪৩ -পূর্ববর্তী দু-দশক আগে থেকেই, প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দুর্ভিক্ষপ্রবণ একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল অবিভক্ত বাংলাদেশে। অর্থনীতিবিদ এ. রঙ্গস্বামী তাঁর প্রায় পঁচিশ বছর আগের একটি নিবন্ধে এ পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে ভেঙে - গড়ে একটি শব্দের ব্যবহার করেছেন— 'Famishness' এই Famishness বা দুর্ভিক্ষপ্রবণ পরিস্থিতিতে ভিটেমাটি ছিঁড়ে আসা অগনণ মানুষের স্রোত অথবা যেন চড়ায় আটকে পড়া মরণের ঝাঁক, যেগুলি দুর্ভিক্ষের দৃশ্যমান চিহ্ন, দেখা যায় না কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সকল শক্তি ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে যাবে সমাজের বিপুল এক মানবসমাহার থেকে। অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ ক্রমাগত স্থানান্তরিত হয় গ্রামীণ দরিদ্রদের হাত থেকে ধনীদের হাতে। বাংলাদশের ক্ষেত্রে তেমনটা অনেকখানিই ঘটেছিল গ্রামীণ দরিদ্রদের হাত থেকে শহরের ধনীদের হাতে। তবে এহেন পরিস্থিতিতেই জনতার সেই অংশগুলিই ক্রমশ তৈরি হয়ে যায় যারা ক্রমশ উৎপাদনের এবং প্রতিরোধক্ষমতায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে একসময় দলে দলে মরে যাওয়ার জন্য মজুত থাকবে। এই খিদের মনস্তত্বের মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অর্ধাহারের মধ্যেই মানুষ এমন কল্পনায়, ভাবনায় নৃশংসতায় আতঙ্কে পৌঁছতে পারে, অনাহারে পারে না, কারণ অনাহার তার অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয় এবং মাণিকবাবুই পারেন এমন পর্যবেক্ষণে পৌঁছতে, নিজেই গৌর পৌঁছায় রঘুর বাড়িতে, হাজির হয়, যখন রঘুর বাড়িতে ধান সিদ্ধ করার গন্ধ, যে গন্ধে গৌরের সেই অর্ধাহার পলকে হজম হয়ে তার খিদেকে শানিয়ে তোলে, তখন রঘুর বউ বিরজাই তাকে হুঁশিয়ারি দেয়, ''ধান যদি চাইতে এসে থাকো গৌর ঠাকুর পো—'', এবং কদিন আগে যে রঘু সেই স্বাস্থ্যল উচ্চারণে গৌরকে বলেছিল, ''চাল বাড়ন্ত, চাল নে যা দু কুনো। কথা কীসের অত?' সেই রঘুই গৌরকে বলে, ''ধান পেলে কিছু শোধ দিস তোর কাছে যা পাব।''

অর্থনীতির আধুনিক গবেষণার সহায়তা নিয়ে কথাসাহিত্য সংক্রান্ত এ লিখনে পূর্বেই বলতে চাওয়া হয়েছে, যুদ্ধই একমাত্র কারণ নয় মন্বন্তরের, বরং যুদ্ধই সেই মহাধাক্কা যা গ্রামীণ জনতার প্রতি ক্রমশ বিরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ব দুই দশকের অর্থনীতিকে প্রতিবেশকে একটানে মন্বন্তরে পরিবর্তিত করেছিল। ফলত, গ্রামীণ জনতা বুঝতেই পারেনি কীভাবে কখন সে খাদ্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাছে। যুদ্ধপূর্ববর্তী দুই দশক ধরে গ্রামীণ আয়ের তুলনায় (যা মূলত কৃষিজ আয়) শহুরে আয় (যা মূলত বাণিজ্য ও নির্মাণ সংক্রান্ত আয়) বেড়ে যাচ্ছে, একইভাবে কমে যাচ্ছে মাথাপিছু গ্রামীণ আয় এবং বেড়ে যাচ্ছে মাথাপিছু শহুরে আয়, যুদ্ধপূর্ববর্তী মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কা সামলাতে ঔপনিবেশিক সরকারের বাজেটে জনকল্যাণমূলক ব্যয়ে যে তুমুল কাটছাঁট করতে হচ্ছে (১৯৭২-২৮এ এই খাতে ব্যয় ছিল ২৭ শতাংশ, ১৯৩৭ - ৩৮ -এ সেটি নেমে আসছে ১৫ শতাংশে), ফলে সেচ, পথঘাট উন্নয়নে ব্যয়হ্রাসের কারণে গ্রামীণ আয় আরও সংকুচিত হচ্ছে— এবংবিধ নানা কারণে খাদের দিকে গ্রামীণ জনতার পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, এসব তো অধুনা গবেষণা উন্মোচিত তথ্য, মানুষ এসব ঠাহর পাবে কীভাবে। তবু, তারা, খিদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আশঙ্কা করে আতঙ্কিত

হয়, মানিকবাবু যেমন লেখেন—

ভাববার ও বুঝবার চেষ্টা করে যে এসব কি ব্যাপার। ধারণা করার ক্ষমতা দিয়ে কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না শুধু গত দিনের দিনগুলি অভিজ্ঞতা তাদের ব্যাকুলতা এনে দেয়, অনির্দিষ্ট ভয়ের সাড়া জাগায়। কী একটা প্যাঁচে যেন তারা পড়েছে, কী যেন মুশকিল ঘটবে তাদের বিপদ আসবে। অভাবের জীবনে অভাব বাড়ে কমে, দুর্ভোগ চড়ে নামে, ওসব খাপছাড়া কিছু নয়। এবার সব উলটোপালটা, গোলমেলে, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে।

বিজ্ঞানের ছাত্র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন রাজনৈতিক - অর্থনীতির নিবিড়তর নিরীক্ষণ আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন কখনও পর্যবেক্ষণ ও অনুভব দিয়ে এবং অবশ্যই নিয়মিত অধ্যয়ন দিয়ে। পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটিয়ে তোলা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটি অংশকে তাঁর গণিতপ্রেমী মেধা দিয়ে তখনই বুঝে নিয়েছেন এবং আখ্যানের গদ্যের সকল মায়া সরিয়ে যেন সমাজবিজ্ঞানের গদ্য দিয়ে সেই বিপর্যয়কে প্রকাশ করেছেন। সে বিষয়টি হল ফসলের বাণিজ্যিক পণ্যায়ন। দুর্ভীক্ষ-পূর্ববর্তী কয়েকটি দশকে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চাপেই বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জেরেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। এবং এই প্রক্রিয়ায় যখন খাদ্যের ঘাটতি ক্রমশ নিশ্চিত করে ফেলল তখনই দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরগুলিতে বাণিজ্যিক পণ্যায়নের চাপ এসে পড়ল খাদ্যশস্যের এই Foreed monitarisation তেমন জুতসই বাংলা এখনই খুঁজে বার করা গেল না, তবে চালের Foreed monotarisation কীভাবে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্নাভাবকে অনিবার্য করে তুলেছিল তার দলিল হয়ে আছে চিন্তামণির দ্বিতীয় পর্ব। হয়তো এই গদ্যাংশকে অনায়াসে সমাজবিজ্ঞানের কোনও অধ্যায়ের মধ্যে ঠাঁই দেওয়া যেতে পারে। মাণিকবাবু লিখে রাখছেন যে ধানের দাম এমন চড়ে গেল যে চাষি তার তিন পুরুষের স্বপ্নেও ভাবেনি এবং ধানের দাম চড়া মানেই চাষির লক্ষ্মীর বাড়া। তিনের দরে একমন ধান বেচে তিন টাকা, সাতের দরে এক মন ধান বেচে সাত টাকা, কিন্তু এবার জমিদার খাজনা চাইছে। ধান যার কম আছে সে টাকায় আর ধানে দিক। ধান যার তার ভাবনা কী, ধানেই খাজনা শোধ। সুতরাং জমিদারি খাজনা ধানের অভাব বাড়িয়ে দেয়। তদুপরি টাকার স্বপ্নে ধান বেচে চাষির ঘরে বীজধানের অভাব। বীজধানের দাম কৃষকের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সুতরাং আবার টাকার ঋণ। টাকার ঋণে বীজধান কেনা। বীজধান বুনে খেতে ফসল। কিন্তু চাষি জানে এ ফসল চলে যাবে টাকার ঋণ মেটাতে, সুতরাং তার মন কেঁপে কেঁপে ওঠে, আতঙ্কজড়িত ক্লেশের মতো একটা অনুভূতি তাকে খোঁচায় কারণ সে জানে এ ফসলে কারও পেট ভরবে না।

উপরের অনুচ্ছেদটির সকল বাক্য এই লিখনদারের নয়। বহু বাক্যে বহুল অংশ স্বয়ং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কখনও কখনও একাধিক পূর্ণ বাক্যও। অথচ এই বাক্যগুলিকে বর্তমান নিবন্ধের না-সৃজনমূলক বাক্যগুলির মধ্যে আত্মসাৎ করার জন্যে যেটুকু রীতি মানা উচিত, অর্থাৎ কথাসাহিত্যের বাক্য, বাক্যখণ্ড এবং শব্দগুলিকে উদ্ধৃতিচিহ্ন দিতে স্বতন্ত্র করা, সেই মান্যরীতিকে উপেক্ষাই করা হল। করা হল এইটুকু অনুভব করতে, প্রয়োজনে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের গদ্য সমাজবিজ্ঞানের গদ্যের কত কাছে আসতে পারে। এই গদ্যে তিনি শুধু 'ধান' আর 'টাকা' শব্দদুটি চালাচালি করে চলেন। আবার এই উপন্যাসেই তিনি ব্যবহার করেন চিন্তামণিকে লেখা হরমণির চিঠির বয়ান, সে বয়ানে বানান-ব্যাকরণ-যতিচিহ্নের প্রচলিত রীতিনীতিগুলি মুছে দিয়ে এক মহিলার অপটু লেখার এবং বলার ভাষায় নিপাট ধ্বনিজগতকেই তুলে আনে। আর উপন্যাস জুড়ে মাণিকবাবুর সংলাপ লেখার দক্ষতা তো আছেই। গদ্যের এই তিন ধরনের সংঘর্ষে চিন্তামণি জুড়ে এমন এক গদ্যভাষা তৈরি হয়েছে, যখন কাহিনির তো বটেই, প্রায়ই গদ্যের জোড় খুলে যায়, আর তখনই সেই ভাষা দুর্ভিক্ষ-পূর্ববতী ঠিক আগের বছরটির অনাহার, অসহায়তা, আতঙ্কের ঝাঁঝটি তৈরি করে রেখে যায়।

জমির মালিকানার পরিমাণ অনুযায়ী খিদেয় আক্রান্ত হওয়ার মাত্রার যে তারতম্য ঘটে তা আমরা চিন্তামণির অগ্রগতিতে দেখেছি। চাঁদকাকা-কালাচাঁদ-গৌর-রঘু—খিদেয় আক্রান্ত হওয়ার ক্রমান্বয়ী ধাপটা এইরকম। উপান্তে এসে দেখছি গৌর যতখানি আক্রান্ত হচ্ছে রঘু ততখানি হচ্ছে না। অতএব একই পেশা একই কৌমের মধ্যে বাস করলেও ভূ-সম্পদের মালিকানার হেরফের অনুযায়ী অনাহারে আক্রান্ত হওয়ার মাত্রারও হেরফের ঘটে। কারণ জমির মালিকানার তারতম্য অনুযায়ী সঞ্চিত খাদ্যশস্যের পরিমাণেও তারতম্য ঘটে। যে সঞ্চিত খাদ্যশস্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে অনাহারকে কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে। আবার যেখানে জমির মালিকানার তারতম্য এতখানি কম সেখানে পরিভূক্ত ভোক্তার সংখ্যার উপরেও অনাহারের তারতম্য নির্ভরশীল। চিন্তামণিতেই আমরা শুনব অনাহার অথবা অনাহারের সম্ভবনার হিসাব নিকেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন পরিবারে ক'টা 'পেট' তা নিয়েও কথোপকথন উঠে আসছে।

এই তারতম্যগুলোই আমাদের অর্থনীতির সেইসব পর্যালোচনার প্রতি মনোযোগী হতে বলে যেখানে জমির মালিকানার তারতম্য অনুযায়ী গ্রামীণ কৃষিসমাজকে একাধিক অংশে ভাগ করা হয় এবং যে ভাগ না থাকলে মন্বন্তরের মানচিত্র বোঝা যায় না। জমির মালিকানা যথেষ্ট বেশি হলে, জমির কাজে মালিককে অংশগ্রহণ করতে হয় না, উদবৃত্ত ফসলের পরিমাণও বেশি হয়, ফলে ফসলের মূল্যবৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ সে গ্রহণ করতে পারে, তার শক্তপোক্ত অবস্থান অনুযায়ী গ্রামীণ কৃষিশ্রমের ব্যবহার ও কৃষিশ্রমের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্যদিকে যে যত কম উৎপাদনকারী তাকে তত বেশি ক্রয়ের উপর নির্ভর করতে হয় এবং সে তত বেশি খাদ্যশস্যের চড়া দামের কারণে আক্রান্ত হয়। ভূমিহীন কৃষক বা খেত মজুর পূর্ণত ক্রেতা, সুতরাং মন্বন্তরগামী মূল্যবৃদ্ধির ফাঁস এড়ানোর দানামাত্র উপায় তার হাতে নেই। সে খিদের

খাদ্য। সর্বাগ্রে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খিদের গল্পে মন্বন্তর যেসব পরিবারের শরীর, সন্তান ও নারীকে খেয়ে নিচ্ছে তাদের অর্থনীতিগত অবস্থানও সচেতনভাবেই জানিয়ে দেওয়া হয়। 'আজ কাল পরশু...' অথবা 'দুঃশাসনী'তে রমাপদর বউ মুক্তা এবং আনোয়ারের বউ রাবেয়ার পরিচয় দেওয়া হয় 'চাষাভুষো গেরস্থ ঘরের বউ' এবং 'চাষিঘরের বউ' বলে। তবে এরা নেহাতই প্রান্তিক কৃষক সেটুকু সহজবোধ হয় এদের বিপরীতে যে চরিত্ররা থাকে তাদের প্রতিপত্তিমূলক অবস্থান দেখে। এই প্রতিপত্তির অধিকারী অংশের প্রসঙ্গে আলোচনায় পরে আমাদের ফিরতেই হবে। 'গোপাল শাসমল'- এর ভূষণ গ্রামের জোতদার কানাইয়ের কৃষিশ্রমিক। 'নেড়ী'-র গগন মাইতি 'অমানুষিক' -এর ছিদাম 'জমিজমা'র মালিক হলেও সেই জোতের পরিমাণ এতই সামান্য যে ঋণের প্রথম ধাক্কাতেই সেটুকু হয় বন্ধক রাখতে হয়, না হয় বিক্রয় করে দিতে হয়। 'বেড়া'র গোবর্ধন - জনার্দন হাতি কিংবা 'পেটব্যথা'-র ভৈরব সন্তান - সন্ততি খয়রাতি দিয়েও 'দুর্ভিক্ষটা কোনোমতে সামলেছে' তাদের সামান্য জমির তাগতেই। 'পেটব্যথা' -র ভৈরব আপাতত বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এইটুকু ভাবতে ভাবতেই 'আর ক'টা দিন পরেই মাঠের ফসল' তার ঘরে উঠবে।' এবং এখনই এটুকু বলে নেওয়া প্রয়োজন গ্রামীণ কৃষক সমাজে জমিদার থেকে খেতমজুর অন্তত যে ছ-টি বিভাজনের কথা আমরা উল্লেখ করতে চেয়েছি তাদের প্রথম তিনটি ধাপ, — জমিদার, বৃহৎ কৃষক ও মধ্যকৃষক বাদ দিলে, ক্ষুদ্র কৃষক থেকে ভূমিহীন কৃষক বা খেতমজুর পরবর্তী তিনটি ধাপের মধ্যে আর্থিক এবং সম্পদগত সঙ্গতির ফারাক এতই কম যে অর্থনীতির বড়োসড়ো কোনও ধাক্কায় এদের মধ্যে যেকোনো বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। আজ কাল পরশুর প্রথম গল্পে রমাপদর বউ শহরে গিয়ে তার সংস্কার হারিয়েছিল, তার আগে অবশ্য মুক্তার ছেলেটিও মারা গিয়েছিল। 'দুঃশাসনীয়'-র রাবেয়া বস্ত্রাভাবে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। 'নমুনা'-র কেশব ব্রাহ্মণ তার মেয়ে শৈলকে বিক্রি করেছিল মেয়ে কারবরি কালাচাঁদের কাছে। 'গোপাল শাসমল' -এ রতন জোতদার কানাইয়ের কাছে শরীরের বিনিময়ে চাল চাইতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। 'নেড়ী' -র তারা এবং মনা দুজনেই হৃদয় পণ্ডিতের মেয়ে-কারবারের উপাদান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে য্ঠে, তার আগে অবশ্য মা ও মেয়ে তারা এবং মনা তাদের সকাল সন্তান-সন্ততিদেরই হারায় দুর্ভিক্ষে। 'অমানুষিক' -এর ছিদামের মা ও মেয়ে মরেছিল আর বউ কুব্জা বনেছিল ললিতবাবুর রক্ষিতা। এবং 'বেড়া'-র গোবর্ধন - জনার্দন হাতিরা কিংবা 'পেটব্যথা'-র ভুবনরা দুর্ভিক্ষটা কোনোমতে সামলাতে পারলেও সন্তান-সন্ততির জন্য জীবনমূল্য তাদের দিতেই হয়েছিল।

এগুলি সবই মহাখিদের প্রকাশ্য ক্ষত। কাহিনির নক্সা জমিনে এগুলিকে সাহিত্যের শর্ত মেনেই উৎকীর্ণ করে দেওয়া কম দায় নয়। শিল্পের প্রতি দায় এবং সমাজ সময়ের প্রতি দায়ের মধ্যে জোড় বাঁধতে শেখার অনুক্ষণের লড়াই লড়তেই হয় একজন শিল্পীকে। আংশিকভাবে নয়, এই লড়াইটা পূর্ণতই লড়েছেন মাণিকবাবু ২০ বছর বয়সের পর বাকি ২৮ বছর তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে। এই ২৮ বছর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবিত্ত এবং অচিরেই নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন এই লড়াইটারই অনুক্ষণ ব্যস্ত ময়দান। শুধু ধারণা বা চেতনা দিয়ে নয় শারীরিকতা দিয়েও এই লড়াইটা তিনি লড়ে গেছেন ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬।

সেই লড়াইয়ের সুবাদে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও গল্প যেমন বিশ শতকের বাঙালি খিদের চূড়ান্ত পর্বের বিশ্বস্ত দলিল, খিদে-খাদ্যসংগ্রহ - কোন্ অংশে জনতা মরণান্তিক খিদে আক্রান্ত, সবটুকুই নিয়ে বিশ্বস্ত দলিল হয়ে থাকল তেমনই শিল্প একক হিসাবেও সেগুলি কালের সঞ্চয় হয়ে উঠল। এবং উত্তরণের একটি ন্যায্য কারণ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে খিদের মনস্তত্ব নিরীক্ষায় তাঁর নিরসল মনোনিবেশ। প্রারম্ভির যৌবনে বিজ্ঞান ও গণিতের বিদ্যায়তনিক ছাত্র হিসাবেই মনোবিজ্ঞান পাঠের প্রতি যে টান তিনি অনুভব করেছিলেন সেই টান থেকে নিজেকে খুলে নেওয়ার স্বস্তি কখনোই পেতে চাননি তিনি। মনোবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক অগ্রগতি ও আধুনিকতার যে পাঠ তিনি নিয়েছিলেন প্রতিটি চরিত্রের মনোপরিবেশে গহনে চলে যাওয়ার প্রবণতায় সেই পাঠ নিশ্চয়ই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল এবং সহায়তাও করেছিল। এবং ঘটনা হল এই, কথাকার জীবনের কোনো পর্যায়েই সেই প্রবণতা থেকে তিনি সরে আসেননি।

এবং এই প্রবণতায় যা তিনি অর্জন করলেন তা হল শারীরিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবেশের পরিবর্তনের সংযোগ নির্ণয়। হয়তো এটাই স্বাভাবিক ছিল, অন্তত যখন তিনি মূলত খিদে এবং খিদেয় মরে যাওয়ার গল্প লিখছেন। আবার এই স্বাভাবিকতা তার স্বাতন্ত্র অর্জন করে নেয় এখানেই যে ক্ষুধা ও ক্ষুধাজনিত মৃত্যুর গল্প লিখতে বসে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নেহাত শারীরিক দুঃসহতার অনুপুঙ্খেই আবদ্ধ থাকলেন না; মানুষ যে কোনও স্তরের মানুষ যে কোনও মূহূর্তেই যে মূলত ভাবুক, তাই প্রতিপন্ন করতেই তাঁর মৌলিক আগ্রহ। এবং সেই সঙ্গেই তিনি এও নির্ণয় করে রাখলেন, ব্যক্তিক মনস্তত্ব প্রায়শই সামূহিক মনস্তত্ত্বের বিস্তৃত পরিসরের দিকে পথ খোঁজে, সেখানে গিয়ে মিশতে চায় অথবা সেই সামূহিকতার টানে সাড়া দিতে চায়।

মানসিক জলবায়ুর একেবারে মৌলিক পরিস্থিতিগুলিরও নিয়ামক হয়ে ওঠে খিদে। সন্তানশোকের মতো মানসিক আবহাওয়াও তাহলে খিদের উপরেই নির্ভরশীল। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনটাই দেখেছেন, তেমনটাই দেখিয়েছেন যখন তিনি তেতাল্লিশের গদ্য লিখেছেন। আজ কাল পরশুর মুক্তা তার সন্তানশোকে প্রকাশ্যে চোখের জলের অক্ষরই

খুঁজে পায়নি ততদিন ধরেই, 'না খেয়ে যখন ভোঁতা নির্জীব হয়ে গিয়েছিল তার অনুভূতি। সেই শোককথনে তার 'গলা ধরে চোখে জল আসে' তখনই যখন তার খিদে প্রশমিত, শরীর পুষ্ট। সুতরাং সন্তান—শোকার্ত হওয়ার জন্যে শারীরিক ক্ষমতাও লাগে, যে ক্ষমতা দেয় ক্ষুধাবিনাশী নিয়মিত খাদ্যের সরবরাহ। সেই সরবরাহে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পর, ন্যায্যতই, সেই ক্ষমতা ছিল না 'নেড়ী'-র মা ও মেয়ে তারা ও মনার। সে কারণ ও 'আজ কাল পরশু'-র মতোই প্রায় একই শব্দ সমাহার প্রয়োগে দেখিয়ে দিতে চান মাণিকবাবু : 'এমন শোকার্ত হওয়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অনুভূতি ভোঁতা হয়ে এসেছিল খানিকটা, দেহে শক্তিও ছিল না অতখানি।' এবং শোকে যে কান্না আসে না, সহানুভূতিতে শোক যে আরও উতল হয় না বা সে যে আর সমবেদনাও দাবি করে না, এটা দুর্ভিক্ষের বাজারে মেয়েমানুষের কারবারি কালাচাঁদও লক্ষ করে উঠতে পারে ('নমুনা')।

খিদের নিরন্তরতায় যৌনবোধও অন্তর্হিত হয়, এমন আভাসও দিয়ে রাখলেন মাণিক দ্রুতটানের একটি বাক্যে যা 'নমুনা'- রই, শৈল প্রসঙ্গে, 'তার নারীদেহের সহজ ধর্ম রক্তমাংসের আশ্রয় ছেড়ে শিরায় গিয়ে ঠেকেছে।'

আবার খিদের এ নিরন্তরতা নেহাত শারীকিতাকেই কতরকমের বদল হেনে দেয় তারও হরেক দৃষ্টান্ত খোঁজ হল। উকুনের কামড় খাওয়া, উকুন মারা, উকুনের কামড় খাওয়ার বোধ দিয়ে দিয়ে খিদের দিনগত দৈর্ঘ্য ও ঘনত্বকে মেপেছিলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্ভিক্ষের প্রথম পর্যায়ে ''চুলের অরণ্য থেকে উকুন খুঁজে এনে দুই বুড়ো আঙুলের নখে টিপে পুট করে মারবার মুহূর্তটিকে বিশ্বসংসার তুচ্ছ হয়ে যায় তারার কাছে। শরীর বেশ খানিকটা শুকিয়েছে, নোলায় জল কম। তবু জিভে দিব্যি আওয়াজ হয় উস্‌স্‌— উকুন মারার পুট শব্দের সঙ্গে। ''খিদের দিনকাল যখন আরও এগিয়ে যায়, যখন তারার স্বামী গগনের চলে যাওয়ার উপক্রম হয়, চলে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়, তখন তারার শরীরকে খিদে এতই দখলে নেয় যে উকুনের কামড়ের অনুভূতি আর অবশিষ্ট থাকে না : ''উকুনের কামড় তার আর অনুভব করে না, বোধশক্তি আরও ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।'' খিদের প্রবাহ খিদে বা খাওয়া নামক শারীরিক ক্রিয়াকেই কতভাবে প্রভাবিত করে। সেই শৈল প্রসঙ্গেই, 'খিদের বালাইও যেন তার নেই। সে তো টানা না-খাওয়ার ফলেই, আবার এই শৈলরই 'কালাচাঁদের সঙ্গে যেখানে হোক গিয়ে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়ার কথা ভাবলে তার শুধু ঘন ঘন রোমাঞ্চ হয়।' কিংবা '...পেট মোটা ছোটো ভাইটার কাঁচা পেয়ারা চিবানো পর্যন্ত তার কাছে রোমাঞ্চকর ঠেকে।' 'অমানুষিক' -এর গাবো তার সমস্ত জীবননীশক্তি সংহত করে ছিদামের কাছে খাবার চেয়েছিল, অবশেষে পেয়েওছিল, কিন্তু 'বেশি ভাগ বসাতে পারেনি?। কিছু খেয়েই সে গলা আটকে বলেছিল, জ-জ-জ জল'। সুতরাং নিয়মিত না খেয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও যে চলে যায় সে কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় 'প্রাণ' গল্পে, অটল-মালতির সহসা খাদ্যপ্রাপ্তি এবং এক দুপুরের খাওয়া প্রসঙ্গে :''খেতে সময় লাগে খুব কম। যে রকম ভোজ ভাবে ভেবেছিল আটল তা হয় না, অল্প খেয়েই পেট ভরে যায়, জিভে স্বাদ লাগে না। না খেয়ে না খেয়ে খাওয়ার ক্ষমতাও গেছ।'' খিদে শারীরিকতায় কত বিচিত্র পরিস্থিতি তৈরি করে তা এই উদ্ধৃতি যদি আর একটু টানা গেলে প্রকাশিথ হত। অথচ আমরা 'প্রাণ' -এর এ উদ্ধৃতি সহসা শেষ করলাম ঠিক এর পরের বাক্য থেকেই পরবর্তীতে আরও একবার ওই অনুচ্ছেদে ফিরতে হবে বলে। আপাতত অন্যত্র।

খিদে একটি শরীরের, নারী শরীরে কতদিন বাস করছে, কত নিরঙ্কুশ প্রতাপ নিয়ে বাস করছে, তার সূচক হয়ে ওঠে স্তন। মাণিকবাবু অবশ্য 'মাই' শব্দটিই ব্যবহার করেন। সে যেন এক অব্যর্থ চিহ্ন হয়ে ওঠে, খিদেকে বহন করার চিহ্ন, নিজে বেঁচে থেকে অন্য প্রাণকে বাঁচানোর ক্ষমতার চিহ্ন, এমনকি খিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী লড়াইয়ের চিহ্ন, মুক্তাই তার সন্তান মৃত্যুর বর্ণনা শুরু করেছিল এইভাবে— ''খোকন গেল কুপথ্যি খেয়ে। মাই-দুধ শুকিয়ে গেল, এক ফোঁটা নেই।'' মানা এল তার মা তারার কাছে তার শ্বশুরগৃহ পাঁচনিখে থেকে স্বামী এবং সন্তানশোক নিয়েই, সঙ্গে শুধু খিদে এবং আর একটি কচি কন্যাসন্তান। পিতৃগৃহে এসেই মনা যা করে তার বর্ণনায় 'মাই' শব্দটি ব্যবহৃত হল। সেই ব্যবহারই সূচকের কাঁটার মতো নিমেষে দেখি দিল খিদের নিরিখে মা ও মেয়ের অবস্থানে ন্যূনতম তফাৎও নেই - ''মনা তার মেয়েটাকে মার কোলে তুলে দিয়ে বলে, একটু মাই দে মা ওকে। মোর দুধ শুকিয়ে গেছে। তারার যেন বাকি আছে বুকের দুধ শুকিয়ে যেতে! 'প্রাণের গুদাম' গল্পের ভিখারিণী তার ছেলের অপুষ্ট শিশু শরীরের কারণ দর্শাতে গিয়ে একটা কথা বলেছিল 'আমি না খেতে পেলে দুধ পাবে কোথা?' এই চিহ্নটিই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উঠে আসে খতিযান -এর 'ছিনিয়ে খাইনি কেন' গল্পে। পরপর দুটি অনুচ্ছেদে 'মাই' বর্ণিত হল এবং সেই প্রসঙ্গই হয়ে উঠল দুর্ভিক্ষের অনাহারে থাকা নারীদের অসুস্থতার এবং অনাহার রুখে দাঁড়িয়ে থাকা এক নারীর সুস্থতার সূচক। যোগী ডাকাতের চোখে দুর্ভিক্ষপীড়িত নারীরা, 'মেয়েছেলে! হাড়ে জড়ানো সিটে চামড়া তাতে ঘা-প্যাঁচড়া। আধওঠা চুলের জট খ্যাপার মতো চুলকোচ্ছে উকুনের কামড়ে। মাই বলতে লবঙ্গর মতো শুকনো বোঁটা,...।' পরের অনুচ্ছেদেই যোগীর বউয়ের বর্ণনা আমি পক্ষে (1st person) -''পরিবারটিও তার রোগা ঢ্যাঙা ছিপছিপে - তবে সুস্থ। কোরা কাপড়ের ভাঁজে ছোটো নিটোল মাই, আবার সন্তান আসতে চাইলে যা সুধায় ভরে উঠবে অনায়াসে।' সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে স্তনের গড়নের বিপর্যয় যেমন শুধু অসুস্থতার নয় অনিবার্য মরণ, পচন ও শেষের পূর্বলক্ষণ হয়ে ওঠে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার 'নিটোলতা' শুধু সুস্থতার নয় আগামী প্রাণের সমাসন্ন সম্ভাবনার নিশ্চিত সাবুদ হয়ে দেখা দেয়।

আবার এই সাবুদটিকেই গাবো, 'অমানুষিক' -এর সেই ভিখারিণী যে ছিদামের সঙ্গ নিয়েছিল, তার ক্ষমতার নজির হিসাবে ব্যবহার করে, যে ক্ষমতা দিয়ে সে আরও একটা প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা রাখে, যা তার অবশিষ্ট

নারীত্বের ক্ষমতার সাবুদ, যে ক্ষমতা দিয়ে একটি অতি প্রয়োজনীয় অভিনয়কর্ম সে সার্থক করতে পারবে, যে অভিনয় তার ক্ষুধা নিবারণের জন্যে জরুরি। সুতরাং ক্ষুধা নিবারণের অভিনয় - সংগ্রামে মাই-ই সবথেকে বড়ো মূলধন। ছিদামের প্রশ্নের উত্তরে গাবো যা বলে এবং ছিদাম যা দেখে:

> 'ক্যান বাঁচবো না? গাবো গর্জে উঠেছিল ক্ষীণকণ্ঠে, মাই দিয়া দুধ পড়ে অখনো, দ্যাখো নাই? মাই টিপে দুধ বার করে আবার সে দেখিয়েছিল ছিদামকে। বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দিয়েছিল মাই। সেই চামড়াঢাকা প্রাণটুকুর যে কোনো প্রাণের স্তন্যপানের শক্তিশালী লীলাটা চেয়ে চেয়ে দেখেছিল ছিদাম।

অখন্ড খিদের এই দুনিয়ায় যখন বোধ-বুদ্ধি-অনুভূতি সবই ভোঁতা হয়ে যায়, তখনও মানুষ যেহেতু সে মানুষ তার শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ের সঙ্গে তার মনকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইটাও লড়ে যায়। খিদের অখণ্ডতার মধ্যে হঠাৎ যথেচ্ছ খাদ্যপ্রাপ্তির শারীরিক প্রক্রিয়ায় কত ধরনের বিপর্যয় হানে তার একটা ছবি পাওয়া গিয়েছিল 'নমুনা' -তে। সদয় ডাক্তারের নাতির মুখেভাতে নিমন্ত্রণ খেয়ে কেশব চক্রবর্তীর বাড়ির প্রায় সকলের 'দম আটকে মরণদশা' হয়েছিল। এবং সেই 'পেট ভরে' খাওয়ার সবটা কেশব চক্রবর্তীর মেয়ে শৈলর সয়নি বলেই, সে স্বাভাবিক ছিল, তার খাওয়া শেষে ঘুম স্বাভাবিক ছিল। সেই 'পেট ভরে' খাওয়া মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগের গাঢ়তা নিয়েই এই গল্পেই দু গুচ্ছ বাক্য ছিল—

> উদরের ভোঁতা বেদনা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে মাথার মধ্যে সব ঝাপসা করে রেখেছে কী করা উচিত তার জবাব কোথায়, কে জানে! ভাবতে গেলে মাথার বদলে কেশবের শরীরটাই যেন ঝিম করে।

পেট ও মাথার মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এই যাতায়াত মাণিকের মন্বন্তরের গদ্যের অন্যতম লক্ষণ। আবার বাক্যের দ্বিতীয় গুচ্ছ, যা একটি বাক্য নিয়েই, সেখানে দেখা যায় পেটের অনুভূতির তীব্রতা কমে গেলে তবে মানসিক অনুভূতি তীব্রতায় আসে। কেশবকে নিয়েই মাণিকবাবুর বর্ণনা - ''পেটের ব্যথা কমতে রাত হয়ে গেল, কেশবের তখন মানসিক সংখ্যাগুলি ব্যথায় টনটন করছে।'' প্রথম ক্ষেত্রে অনুভূতির চলাচল উভয়মুখী— শারীরিক বেদনা মানসিক ক্রিয়ায় অক্ষমতার আনে আবার মানসিক ক্রিয়ায় দুর্বলতা শারীরিক অক্ষমতাকে স্পষ্ট করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই চল একমুখী, শারীরিক অনুভূতির খর্বতা কমে গেলে তখন মানসিক অনুভূতির খরতা চেতনে আসে। কিন্তু শরীর, মন, মানসিক পরিস্থিতির আশ্চর্য সব জড়াজড়ি, এমন জট পাকানো সব জড়াজড়ি যে সখানে শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়াকে প্রহায় আলাদাই করা যায় না, তার দৃষ্টান্ত দেখা গেল অনাহারের ধারায় সহসা যদি-টানা আর একবার সুপ্রচুর খাদ্য পাওয়ার মুহূর্তে, যে মুহূর্ত 'প্রাণ' গল্পের, যে মুহূর্ত বর্ণনার উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে একবার আমরা শুরু করে সহসা ছেদ টেনেছিলাম। অটলের সেই পুষ্টিকর অন্নব্যঞ্জন খাওয়ার বর্ণনা:

> খেতে খেতেই কীসের যেন ঝাঁঝ, কত যেন জ্বালা জুড়িয়ে যাচ্ছে স্পষ্ট অনুভব করে অটল, একটানা একটা যে অদ্ভুত আওয়াজ প্রায় অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল তা যেন ঝিমিয়ে আসতে থাকে দুই কানে। খেয়ে উঠে অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ হতে থাকে প্রথমটা, হঠাৎ ওজন বেড়ে দেহটা যেন দশ গুন ভারি হয়েছে, ভেতর থেকে বুকে কিসের চাপ পড়ার শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে, মাথাটা হয়ে গেছে হালকা, শূন্য। তারপর ঘনিয়ে গভীর আলস্য আর অবসাদ। দুঃখ কষ্ট অস্বস্তি জ্বালাবোধ সব কমে গিয়ে সৃষ্টি সংসার বুঁদ হয়ে আসে নেশায়, গভীর ঘুমে।

এই অনুচ্ছেদটিই 'প্রাণ' -এর পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করবে। পরিণতির পূর্বাভাসও বটে এই অনুচ্ছেদের এই পরিসরেই। সে কথা থাকা। আমরা তো আদতে শরীর ও মনের মধ্যে অনুভব - অনুভূতির চলাচলের শিরা-ধমনী জালিকা বুঝতে চাইছিলাম। আমাদের উদ্ধৃতি অংশের প্রথম বাক্যে যা 'কমা (,)'-য় শেষ হচ্ছে, তা স্পষ্টতই মানসিক পরিস্থিতিকে বর্ণনা করতে চাইছে, 'কমা'-র পরই টানা শারীরিক পরিস্থিতির বর্ণনা পাঁচটিল বাক্য ধরে— মুখের আওয়াজ ঝিমিয়ে আসা, শারীরিক অস্বস্তি, দেহের অতিভার, মাথার ওজনহীনতা তারপরে দুটি বাক্য। প্রথম বাক্যে 'আলস্য' পরের শব্দ 'অবসাদ' -এ শরীরের সঙ্গ জড়িয়ে থাকে মূলত মনের শরীর। পরের বাক্যের শেষ দুটি শব্দের আগে পর্যন্ত কেবলই মন, হয়তো মনের সংলগ্ন শরীরও সেই প্রশমিত মন ও শরীর, দুই-ই আরো শমে আসে 'গভীর ঘুমে।'

এই শমই তো গল্পকে তার ইতিবাচক পরিণতিতে পৌঁছে দেবে।

এই শব খাদ্য প্রাপ্তির। মূলত ক্ষুধানিবৃত্তির। যে নিবৃত্তি মানুষের ব্যবহার ধাঁচ ও মানসিক জলবায়ুকে ইতিবাচক শুভবোধের দিকে ডাকবেই। সুতরাং ক্ষুণ্ণিবৃত্তি যে শমে ক্ষুধার্তকে পৌঁছে দেয়, সেই পৌঁছনোর কারণেই গ্রামীণ সমাজের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রামপদ তার শহরে চলে যাওয়া বউ মুক্তাকে আবার গ্রহণ করেছিল ভাতকে সামনে রেখেই; অনন্ত হাতীর দুই ছেলের দুই পরিবারের মধ্যে প্রবল এবং অনুক্ষণ আড়াআড়ির প্রতীক এজমালি বেড়াটা নিঃশেষ হয়ে যায়, এক হয়ে ওঠে একটিই তকতকে উঠোন, এবং মালতী কিছুতেই শহুরে ভদ্রবাবুর শয্যা পর্যন্ত পৌঁছতে চায় না, কিনারায় এসেও তার মন সায় দেয় না, অটলও তার বউকে ভোগ করতে চাওয়া সেই বাবুটিকে খুন করে দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জিঘাংসাশক্তিই হারিয়ে ফেলে। কারণ 'পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে ওটার পর জ্বালাটা যেন জুড়িয়ে' যায় অনেক অনেক। আজ তাদের ভরা পেটে, আগামীকালের খাদ্য তাদের সঞ্চয়ে। সুতরাং সেই কৃষক নারী নিজের মূল্যবোধকে খুন করতে পারে না, সেই কৃষকও পারে না অন্য একজন মানুষকে খুন করতে। তারা এই মহত্তম অথচ অতি

স্বাভাবিক ও সরল উপসংহারে পৌঁছয়, 'কি জানিস, সেসব মোদের কাজ নয়তো।' এইসব ইতিবাচকতায় পৌঁছানো যায়, মানুষ এইসব ইতিবাচকতায় পৌঁছাতে পারে, কারণ এইসব ক্ষুধার্তের উদরে তখন অন্ন ছিল, এইসব ক্ষুধার্তের আয়ত্তে তখন আপাতত অন্নের ও খাদ্যের সঞ্চয়!

খাদ্য কি তাহলে সমাজের গননে - গহনে এত বড়ো বিধায়ক! শুধু খাদ্য মানুষের আয়ত্ত থেকে বিযুক্ত হলেই সে সভ্যতা ও সংস্কৃতির হাজার বছরের সব অর্জন খসিয়ে দিয়ে ফিরে যায় জান্তবতায়। ক্ষুধার্ত অটল যে জান্তবতায় যায় মালতীর মুখোমুখি : ''চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে মালতীকে সে মাটিতে পেড়ে ফেলে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে হন্যে কুকুরের মতো দাঁত বার করে ফোঁসে, খেয়ে এসেছিস বুঝি পেট পুরে?'' মানবিকতার সব মায়া, টান রীতি, সংস্কার ও অভ্যাস সে মুহূর্তেই ছিঁড়ে ফেলে যখন শুধু একটি বস্তুই তার আয়ত্তে নেই— খাদ্য। পরিবার - প্রতিষ্ঠানগুলি কেমন ভেঙে যাচ্ছিল, ছিঁড়ে যাচ্ছিল জোত - বসতের শিকড় শুধু খাদ্য সরবরাহের জোড় খুলে গেলে, শুধু অনাহারের আঘাতে। আবার খাদ্যসংযোগ ফিরে এলেই সে পুনরায় মানবতায় ফিরে আসে। সে মালতী খাদ্যের অভাবে বেহায়া হয়েছিল (হায়াটায়া সব ভুলে গিয়ে'), 'চালাকচতুর' হয়েছিল, জন্তু হয়ে উঠেছিল ('খেকি কুকুরের মতো'), সেই মালতীই খাবার পাবার পর 'শান্ত ভালো মানুষ হয়ে' যায়, তার মনে পড়ে ফেলে - আসলা গাঁয়ের কথা, 'ঘর সংসার, আপনজন চেনা চেনা মানুষের কথা।' খাদ্যের প্রাপ্তিই তাকে ফিরিয়ে দেয় 'পুরানো হারানো দিনের কথা'য়।

এত খাদ্য সম্পন্ন দিনের কথা। কিন্তু খাদ্য আদৌ নেই যে-সব দিন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সেই দিনের গদ্য লিখছেন তখন দিনগত বাস্তবতা ন্যায্য ও স্বাভাবিক বাস্তবতার অক্ষম অভিনয় করছে। যদি এমনই হয়, যেন প্রেত এ সময়ের সতত জীয়ন্তের অভিনয় করছে। ফলত কোনও বাস্তবতাই আর বাস্তবতা থাকে না— ক্ষুধার্তের বর্তমান বাস্তবতা এবং তার দ্বারা অভিনীত সদ্য অতীতের ন্যায্য বাস্তবতা, কোন বাস্তবতার অর্থ আয়ত্ত করতে পারছেনা। 'অভিনয়' বা অভিনয় - অনুষঙ্গ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই যোজনা। অত্যন্ত আলগা পাঠেও মন্বন্তরের গল্পে এই অনুষঙ্গ অন্তত দু-বার চোখে পড়বে। 'অমানুষিক' -এ ছিদামকে যখন অন্য ভিখারিণীর সঙ্গে জুটে বাচ্চা জোগাড় করে গেরস্থ সেজে ভিক্ষা করতে হয় তখন সমগ্র পরিস্থিতিকে তার মনে হয় 'ও যেন গজেন অপেরার যাত্রাগান।' ভগ্ন বাস্তবতা যখন পুরাতন বাস্তবতার মিথ্যা অনুকরণ করতে চায় নেহাত খাদ্যের তাগিদে তখনই পরিস্থিতি অভিনয়ের মতো অলীক প্রতিপন্ন হয়, এমনকি অভিনেতার কাছেও। পরিস্থিতির আরও ভেঙে ব্যবস্থা করার ঔদার্যই দেখালেন মাণিকবাবু, যা তাঁর শিল্পী মানসিকতায় অধিকাংশতই ঘটেনা:

> গেরস্ত চাষিই সে ছিল ভিক্ষুক হবার আগে, এবার সে ভিক্ষা শুরু করেছে আবার গেরস্ত চাষি সেজে। গাবোকে কুজ্জারই মতো গেরস্থ বউ সাজিয়ে সঙ্গে নিয়েছে কোলে মরোমরো বাচ্চাটাকে দিয়ে।

এই অভিনয় প্রসঙ্গটিই আবার যখন প্রয়োগ করলেন তিনি 'প্রাণের গুদাম' -এ। ভিখারিণীর কোলের শিশুটিকে দেখে শশাঙ্কের মনে হয়েছিল 'একটা অপুষ্ট ভ্রূণ যেন অভিনয় করছে জীবন্ত শিশুর।' এ সেই আশ্চর্য সময় যখন সঙ্গত ন্যায্য বাস্তবতাকে, যা হওয়া উচিৎ ছিল তাকেই মনে হয় অভিনীত বাস্তবতা। এবং এই অভিনীত বাস্তবতা যে ক্ষণস্থায়ী, যা হওয়া উচিত ছিল সেই বাস্তবতা যে নেহাতই সাময়িক, তাও প্রতিপন্ন হয়ে যায় অচিরেই। ছিদাম-গাবোর সেই গেরস্থ সাজার জুটি ভেঙে যায়, সেই কুড়িয়ে পাওয়া সেই মরোমনো বাচ্চাটা মরেই যায়। আর 'জীবন্ত শিশু'-র অভিনয় করা অপুষ্ট 'ভ্রূণ' -র যা হওয়া উচিত ঠিক তেমনটাই হয়। সে মরেই এবং তার মার গল্পের পরিণতিতে সহসা খাড়াই ফলকের মতো দাঁড়িয়ে পবড়ে। এবং এ সেই আশ্চর্য সময় যখন স্বাভাবিক বাস্তবতা ও অভিনীত বাস্তবতা দু-জনেই দু-জনের মুখপানে চেয়ে মুখব্যাদান করে, অপেক্ষা করে এক অনিবার্য ধ্বংসাত্মক পরিণতির। তার কারণ সময়ে ছড়িয়ে দেওয়া প্রসারিত পচন— 'পচা গন্ধে মশগুল হয়ে উঠেছে চারিদিক,...।' মানুষের নীতি-নৈতিকতা -সংস্কার-শুভবোধে পচন। তার কারণ, নেহাত সাদামাটা-খাদ্যের অপ্রাপ্তি, অথবা প্রাপ্তব্য খাদ্যকে আড়াল করে রাখা। সুতরাং খাদ্যসংক্রান্ত 'না' দিয়ে এই সময়ের সকল 'নেতি'কে অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। যেমন 'প্রাণের গুদাম' -এ খাদ্যের পচন দিয়েই শশাঙ্ক চতুর্দিকের পচন নির্ণয় করেছিলেন, ''পচা মানুষের গন্ধ ও কি পচা খাদ্যের মতো? আশ্চর্য কি, খাদ্যই তো প্রাণ মানুষের, খাদ্য থেকেই দেহ।''

আদত কথা হল এই প্রবল পচনে আক্রান্ত হয়েও মানুষ ভাবনার ক্ষমতা হারাতে চায় না। নইলে 'প্রাণের গুদাম'-এর সেই ভিখারিণী শহুরে খাদ্য সম্পন্নতার বিরুদ্ধে অমন শোধ নেয়, যা তার সেই বলা শশাঙ্কের পায়ের কাছে নিস্পন্দ বাচ্চাটা নামিয়ে রেখে : 'তেমার দুধ খেয়ে মরেছে বাবু।' ভাবনার এই অপরাজেয় সক্রিয়তার সেরা উদাহরণ হয়ে ওঠে 'সাড়ে সত সের চাল' অর্জন করা, তা নিয়ে গ্রাম-সংসারের দিকে যাত্রা শুরু করার পরিকল্পনা, যাত্রা এবং যাত্রা শেষে পৌঁছানোর মুহূর্তগুলি। একই সঙ্গে সন্ন্যাসী 'হিসেবি' ও 'কল্পনা করতেও ভারী পটু' প্রথমত হিসাব করে তার খিদের শারীরিতা, কোন্ সময়ে যাত্রা করলে খিদে তাকে মেরে ফেলতে পারবে না, সেই-ই খিদেকে মেরে ফেলে চাল নিয়ে পৌঁছে যাবে তার গ্রাম - সংসারের অন্যদের খিদেয় মরে যাওয়া রুখে দিতে, যারা হয়তো তখনও মরে যায়নি। এবং ঠিক এই প্রান্ত থেকেই শুরু হয় তার কল্পনা— কারা এখনও বেঁচে আছে, কারা মরোমরো? সারা পথ তার শারীরিক সক্ষমতা যা তার খিদের সঙ্গে যুঝবে এবং তার কল্পনা যা অন্যদের জিয়ন্ত অস্তিত্বের কথা অনুমান করছে, জিয়ন্ত অস্তিত্বের আশা কিছুতেই ছাড়ছে না— দুইয়ে মিলিয়ে তার যাত্রাকে সম্ভব করছে। পলাশতিতে পৌঁছানোর পর প্রথম

মরেছিল সন্ন্যাসীর কল্পনাজাত আশা। তার বাড়িতে সে আর কাউকেই পায়নি যাদের উদরে তার বয়ে আনা সাড়ে সাত সের চাল আবার প্রাণ পুঁতে দিতে পারবে। সেই আশা মরে যাওয়ার পরই মরেছিল শারীরিক সক্ষমতার হিসেবনিকেশ। হিসেবনিকেশ সহসা চুকে গিয়ে 'উঠোনে পড়ে' 'নিঃশব্দে মরেছিল' সে। সন্ন্যাসীর শরীর মরলেও হয়তো কল্পনা মরে যাচ্ছে না। গল্পের উনসমাপন বাক্যে জিজ্ঞাসাচিহ্ন একটি কিন্তু জিজ্ঞাসা অনেক যা কল্পনারই সক্রিয়তা— 'কোথায় পালিয়ে কোথায় মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বউঠান সুদ্ধু? গল্পের সমাপন বাক্যে শারীরিকতা ক্রমশ নিঃশেষ হওয়া প্রকাশ করে একটি অসামাপিকা ক্রিয়াপদ— 'ঝিমোতে ঝিমোতে'। এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদটি সমাপনে পৌঁছেতে 'মরে গেল' ক্রিয়াপদে। কিন্তু বাক্যের শুরুতে যে দুটি অসমাপিকা ক্রিয়াপদ আছে— 'ভাবতে ভাবতে', তারা কোনও শেষে থামছে না।

কারণ ভাবনা থামে না। ভাবনা এমনই অপরাজেয়।

হিসেব এবং কল্পনা, শারীরিকতা ও মানসিকতা দিয়ে এই লড়াই পসাশমতির সন্ন্যাসীর ব্যক্তিক লড়াই। খিদের বিরুদ্ধে লড়াই। সময়ে বিরুদ্দেও লড়াই। খিদের বিরুদ্ধে একক লড়াই, ক্রমবিলীয়মান শারীরিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে অন্তর্গত লড়াই সহসা কখনও কখনও যারা খিদেয় আক্রান্ত হল না, সমূহ খিদে যাদের কারিগরি ও সহযোগিতায় তৈরি হল তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাঁক নেয়, কারণ, মানুষ আদতে ভারতে জানে। এবং একক লড়াই ক্রমশ সংঘবদ্ধ ও সংগঠনবদ্ধ লড়াইয়ে পরিণত হয়, তারও কারণ প্রথম পরিস্থিতিতেও মানুষের ভাবনাতেও অতীব সক্রিয়তা আসে। যে রাতে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল যাদব সেই রাতের তীব্র মুহূর্তেই সে অনুভব করে তার সেই ব্যর্থতা— সে কেন ইতিমধ্যেই ভাগচাষের বাটোয়ারা আর বেগার খাটা নিয়ে যে লড়াই বাড়ছিল দিনদিন তাতে যোগ দয়েনি সবার সঙ্গে। এবং সেই রাতেই সে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় বউ - ছেলে - মেয়েকে শহরে ছেলের (গণেশ) কাছে রেখে সে 'ফিরে আসবে' গ্রামে 'তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সাথে যোগ দিতে।'

নিজের শরীর ও অনুভূতির বিলীয়মান ক্ষমতার কথা যা এতক্ষণ বলা হল তার বিরুদ্ধে লড়াই কখন যেন প্রতিবাদী লড়াইয়ের পথ নিচ্ছে। সে ইঙ্গিতও 'আজ কাল পরশুর গল্পে' কিংবা 'পরিস্থিতি'র মধ্যে মিলে যায়। 'সাত সের চাল' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫১-র বৈশাখে মালিক বসুমতী-তে প্রকাশিথ হয়েচিল একটি গল্প তার নাম 'পেটব্যথা'। 'পেটব্যথা'র ভৈরব তার বিরুদ্ধে গ্রামীণ ধনী কৈলাসের অনাচারের প্রতিবাদ করেছিল, বলেছিল, কৈলাসের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে সে থানায় যাবে। তার প্রতিবাদ পরাস্থ হয়েছিল, সে লাথি খয়েছিল কৈলাসের, সে মরণাপন্ন হয়েছিল। তার উপর শারীরিক অত্যাচারের কথা চিকিৎসক কুঞ্জুবাবুও স্বীকার করতে চাননি। কারণ, কৈলাসের সঙ্গে তাঁর বৈধ-অবৈধ লক্ষ্যে প্রগাঢ় যোগাযোগ ছিল। যে অনুচ্ছেদের বসুমতীতে প্রকাশিত 'পেটব্যথা' শেষ হয়ে যাচ্ছে তার শেষ দুটি বাক্য এমন : 'মনে হয় রক্তবমি করে তার পেটব্যথা বুঝি একটু নরম হয়েছে। তার ছটফটানি অনেকটা কমে আসে।'

এই গল্প প্রকাশের পাঁচ মাস পরে এই গল্পটিকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশিত হয় গল্পগ্রন্থ পরিস্থিতি। সেখানে মানিকবাবু যোগ করলেন পাঁচটি অনুচ্ছেদ। বসুমতীতে গল্প যেখানে শেষ হয়েছিল তারপর— একাধিকপংক্তির প্রথমটি, এবং দু-পঙক্তির তিনটি এবং এক পংক্তির একটি। রাম - শ্যাম-যদু-মধু ভৈরবকে প্রহৃত হতে দেখেছিল। নামহীন জনতাংশ চিহ্নিত করতে তিনি হাইফেন-এ চারটি নামজোট তৈরি করলেন মানিকবাবু। এই নামহারা চারজনই ভৈরবকে হাসপাতালে এনেছিল। এই নামহারা চারজনই প্রকাশ করেছিল ভৈরবের অসুস্থ হওয়ার কারণ এবং তারা তিরস্কৃতও হয়েছিল সত্যপ্রকাশের দায়ে, তাদেরকে বোঝানোও হয়েছিল তারা যা দেখেছে তা সত্য নয়। অতঃপর এই নামহারা চারজনই প্রহৃত কৈলাসকে এনে ফেলেছিল রাতে কুঞ্জ ডাক্তারের দরজায়। হয়তো অন্য জনতার সাহায্য নিয়ে, নয়তো এই চারজনই শোধ তুলেছিল কৈলাসের উপর। কিন্তু এই নামহারা চারজনই কৈলাসকে ডাক্তারের দরজায় আছড়ে ফেলে ডাক্তারের বুল বোঝানোকে শ্লেষ হেনে একই সঙ্গে শোধ নিয়েছিল গ্রামীণ সম্পদশালী ও গ্রামীণ সম্পাদশালীর সঙ্গে আঁতাতে বাঁধা বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে।

দুর্ভিক্ষের পর গ্রামীণ ভূস্বামী এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তীর্ণ গণবুনিয়াদকে পেয়ে যায় —এই সত্যটি ইতিহাসের। 'বসুমতী' ১৩৫১ বৈশাখের 'পেটব্যথা'-র পরে পরিস্থিতি ১৩৫৩ -র আশ্বিনের 'পেটব্যথা'তে উল্লিখিত পাঁচ অনুচ্ছেদের সংযোজন এবং ওই সংযোজনে গড়ে নেওয়া গল্পের নয়া পরিণতি, সাহিত্যের ইতিহাসে সত্য।

এই পরিণতিই, হয়তো মন্বন্তরের সব আখ্যানের পরিণতি। এর পরিণতির দিকেই নিশ্চিতভাবে, তাকিয়েছিলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও বাংলা আকাদেমির প্রকাশনা সম্পাদক